IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

সমরেশ বসুর ছোটগল্পে রাজনৈতিক অবক্ষয়ের চালচিত্র

সুপর্ণা বিশ্বাস

গবেষক, কোলহান বিশ্ববিদ্যালয়, চাইবাসা, ঝাড়খণ্ড

উনিশ'শ চল্লিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই সমরেশ বসুর বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে আবির্ভাব। উনিশ'শ বিয়াল্লিশের ভারতছাড়ো আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষ রূপ দর্শনে লেখকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। দু'মুঠো ভাতের জন্য সংগ্রামরত সমরেশ বসুর সঙ্গে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে পরিচয় ঘটে কমিউনিস্ট নেতা সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের। এই সত্যমাস্টারের সান্নিধ্য লাভের পরই লেখক কমিউনিস্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং পরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, পার্টির সান্নিধ্যে আসার পরই তাঁর দৃষ্টি চারপাশের জগৎ ও মানুষের প্রতি প্রতিফলিত হয়েছিল। ইছাপুর গান ফ্যাক্টরিতে কর্মরত ও নৈহাটি-আতপুর অঞ্চলে বসবাসের সুবাদে শিল্পাঞ্চলের নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনদের অসংস্কৃত-অমার্জিত জীবন পরিবেশকে তিনি সম্যক রূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই জীবনাভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর ছোটগল্পে। তাঁর ছোটগল্পে তিনি যেমন সমাজের নীচুতলার মানুষের কথা বলেছেন, তেমনি রাজনীতির প্রসঙ্গও এসেছে মানুষের সাথে অন্বিত হয়েই।

সমরেশ বসুর প্রথম মুদ্রিত ছোটগল্প 'আদাব' (১৯৪৬) লক্ষ্য করলে পাঠকের মনে ভেসে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিধ্বস্ত ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক পটভূমি। ১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগের ডাকা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'-এর ফলে ভারতবর্ষে শুরু হয়েছিল রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। উক্ত গল্পে প্রত্যক্ষরূপে রাজনীতির কথা না বলা হলেও, রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে যুগে যুগে সাধারণ মানুষ বলিদান দেয় সে কথাই লেখক শুনিয়েছেন। ব্যক্তি নামহীন দুটি সম্প্রদায়ের মানুষের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে লেখক অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার মর্মমূলে কুঠারাঘাত করেছেন। হিন্দু-মুসলিম রায়টের ভয়াবহ পরিণতিতে মানুষ একে অপরের হত্যালীলায় মাতোয়ারা। রাজনৈতিক মতাবলম্বীরাই সেই পাশবিক কর্মের অংশীদার। কিন্তু 'নারাইনগঞ্জে'র সুতাকল শ্রমিক বা 'বুড়ীগঙ্গার হেইপারে সুবইডা'র নৌকার মাঝির মতো দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের কাছে দলাদলি, খুনোখুনি একেবারেই অর্থহীন। তাদের একমাত্র কাম্য পরিবারের সুখ শান্তি। তারা চায় পরবের দিনে নিজ সুখী গৃহকোণে ফিরে যেতে, স্ত্রী-সন্তানের মুখে হাসি ফোটাতে। তাই প্রথমে দুই কুশীলব একে অপরের প্রতি সন্দিহান হলেও পরে একে অপরের সুখ দুঃখের ভাগীদার হয়ে ওঠে। কিন্তু ধর্মের কারবারীরা তাদের সেই শান্তিকে কেড়ে নিতে চায়। লেখক তাই পরম মমতায় দুই ভিন্নধর্মী মানুষের আলাপচারিতায় তুলে ধরেছেন দাঙ্গা বিধ্বস্ত সাধারণ মানুষের জীবনবোধকে "আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কী। তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব?"[১] মনুষ্যত্বহীন লোকেদের প্রতি লেখকের ধিক্কার প্রথম গল্প থেকেই বর্ষিত হয়ে চলেছে। মৃত্তিকা প্রোথিত দুই চরিত্রের মাধ্যমে লেখক সমগ্র সমাজকে দিয়েছেন বিশ্বমানবিকতাবোধে জাগ্রত হওয়ার মন্ত্র।

সাম্যবাদী চেতনায় বিশ্বাসী লেখক সমরেশ বসু 'জলসা' গল্পের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন বুর্জোয়া মালিকপক্ষ বিত্তহীন শ্রমিকদের কিভাবে নিজ পদতলে পিষ্ট করতে পারে এবং এই জঘন্য কাজে তারা সাহায্য পায় জনগণের সেবক প্রশাসনযন্ত্রের। শ্রমিকদের তাক লাগিয়ে দেওয়া জলসার আয়োজনের আড়ালে সংগঠিত হয় এগারশো শ্রমিকের ছাঁটাই-এর কাজ। মালিকের অর্ডার নেই তাই শ্রমিকদেরও কাজ নেই। কিন্তু চন্দ্রিকা-সরমারা এই ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। স্বৈরিণী ছেদি তার হাতের মোটা কঙ্কনের আঘাতে সাহেবকে আহত করে। কিন্তু এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেই সংগ্রামী শ্রমিকদের যখন পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তখন জলসার মঞ্চে বাজতে থাকে 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম'। ধর্মের নেশায় মানুষকে বুঁদ করে রেখে তলে তলে সারা হয় শ্রমিক ছাঁটাই। লেখক মনে করতেন সংঘবদ্ধ শ্রমিকের শক্তিতে মালিকপক্ষ শুধরাতে বাধ্য। তাই ভারতবর্ষের মৃত্তিকা ঘনিষ্ঠ সেই সরল মানুষদের ধর্মের ফাঁদে আটকে রেখে উচ্চবিত্তশ্রেণী নিজেদের

উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'-এর সময় রচিত আলোচ্য গল্পে গান্ধীবাদ, ধর্মের অসাড়তা ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের তিক্ততাকে লেখক চিত্রিত করেছেন।

রাজনীতি ও সমাজসচেতন লেখক সমরেশ বসুর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'প্রতিরোধ' গল্পেও রয়েছে অর্থনৈতিক শ্রেণী বৈষম্যের কথা। বিত্তবান জোতদাররা যখন দরিদ্র কৃষকদের অত্যাচার করেও পদানত রাখতে অসমর্থ হয়, তখন শুরু করে নির্বিচার হত্যালীলা। তারা লুঠ করতে চায় দরিদ্র কৃষকের রক্তজল করা সোনার ফসল। সাম্যবাদী লেখক বিশ্বাস করতেন শ্রমিক-কৃষকরা সংঘবদ্ধ না হলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। পঞ্চাশের ভয়াবহ মন্বন্তরের করাল গ্রাসে কবলিত নিরন্ন কৃষককুল সংঘবদ্ধ হয়েছে আলোচ্য গল্পে। তারা চায় সোনার ফসলের দুই তৃতীয়াংশ নিজেদের ঘরে তুলতে।

আকালের কালে যখন খাওয়া জুটত না তখন সুবল গান গাইত। সেই গান ছিল মানাই ও রাধার মতো কৃষকদের সান্ত্বনার বাণী। আকালের পর যখন কৃষককুল সংঘবদ্ধ হচ্ছে তখন সুবলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় শ্রেণীশত্রুদের প্রতি বিদ্বেষবাণী--- "রহিম চাষী মনাই চাষীর ক্ষয় ধরে গো হাড়ে/ আড়তদার রঘু সাউ গুদামে বইসা চাউলের পোকা ঝাড়ে।"[২] গান গেয়েই সে ক্ষান্ত হয় না, সে কৃষককুলকে এই অরাজকতা দূরীকরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটানোর জন্য একদিন শুরু হয় মনাই-শ্রীশ-ফকির-মধু-হেমদের লড়াই। কিন্তু পীতাম্বর শা-সোনা মিঞা-র মতো জোতদাররা চুপ করে বসে থাকে না। নিজেদের সাধ্যে তারা কৃষকদের সমিতির ঘরে আগুন লাগায়, আর প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে মনাইদের নামে হুলিয়া বার করে। কৃষককুল রমণীরা এই তেভাগা আন্দোলনে অস্ত্র ধারণ করেছিল। সেই কুললক্ষ্মীরা মাঠের ধান লুঠ হওয়া বাঁচাতে নিজেদের জীবন বিসর্জন দেয়। জোতদাররা নিজেদের গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিশের সহায়তায় হত্যালীলা সম্পন্ন করে। তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত গল্পটি রাধা ও তার অনাগত সন্তানের আত্মত্যাগে ও সংঘবদ্ধতার নিরিখে লেখকের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে।

সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার ফলশ্রুতিতেই উদ্ভব হয়েছিল বিপ্লবের। বিপ্লবের প্রতীক হল লালঝাণ্ডা। সেই সাম্যবাদী তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমরেশ বসু বেছে নিয়েছিলেন সমাজের একেবারে নীচুতলার মানুষদের। 'কিমলিস' গল্পটি সেই ধারারই পরিচয়বাহী। উত্তর চব্বিশ পরগণার শিল্পাঞ্চল সংলগ্ন বস্তির পটভূমিকায় রচিত গল্পের নায়ক বেচন জেল ফেরত শ্রমিক। বনোয়ারী কাহারের এই ছেলে ছিল সামান্য এক চটকলের স্পিনার। সে কারখানার রেশন হরতালের দাবী জানালে তাকে কারখানার মালিক কৌশলে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। জেল জীবন শেষে সে তার বস্তিতে ফিরে আসে। কারাবাস তার জীবনকে আমূল বদলে দেয়। আদব-কায়দা, পোশাক-পরিচ্ছেদের নতুনত্বে সে পরিবারের লোকেদের কাছেও হয়ে ওঠে এক নতুন মানুষ। শুধুমাত্র বেশভূষায় নয় মনের দিক থেকেও সে হয়ে ওঠে এক অন্য মানুষ। কমিউনিস্ট তত্ত্ব সে কিছুটা বুঝেছে। তার এই কমিউনিস্ট হয়ে আসায় শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধি বাড়িওয়ালা কালিকাপ্রসাদ ভীত হয়। তাই সে বেচনের বাবাকে হাত করে তাকে বস্তি থেকে তাড়াতে চায়।

বস্তিবাসীর কাছে কমিউনিস্ট বা 'কিমলিস' সম্পূর্ণ অজানা বস্তু। বেচন নিজেও ভালোভাবে জানে না কিন্তু বিশ্বাস করে "টাইম যব আ যায়ে গা, ক্রান্তিওকারী সব হো যায়গা এক্‌দম ঠিক সে তব কমনিস্ বন যায়গা।"[৩] বেচন এখানে ব্যক্তি-সংকটের নিরিখে কমিউনিস্ট হতে চেয়েছে। মার্কসবাদ বা কমিউনিজমের তাত্ত্বিক যোগ এক্ষেত্রে খুবই ক্ষীণ। যদিও সে জেল থেকে মার্কসের কমিউনিজম, লেনিনের মার্কসবাদী শিক্ষা এবং রামনরেশ গুপ্তর ভুখা মজদুর বই তিনটি সঙ্গে এনেছে। কমিউনিস্ট নারায়ণবাবুর ব্যাখ্যা সহজে বেচনের মাথায় ঢুকতে চায় না। দক্ষিণপন্থা ও বামপন্থা তার মাথায় গোলযোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু লেখক বেচন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা শ্রমিকের জীবনাভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত সাম্যবাদী চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাই লেখক দেখিয়েছেন শ্রমিকরা যদি অনাহারে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই বেচন ধীরে ধীরে বস্তিবাসীদের মতো হয়ে যায়। শ্রমিক নেতাদের সামনে সে শ্রমিকদের পক্ষে বক্তৃতা দেয়। কারখানার সামনে বক্তৃতার সময় তার ওপর নেমে আসে আকস্মিক আঘাত। এই আঘাতে লুটিয়ে পড়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে বেচন তার পরিবারে প্রতিষ্ঠা পায়। তার অভিজ্ঞতা তাকে নেতার স্থান দেয়। যা সমাজ বদলেরই প্রতীক স্বরূপ। চেতনার স্তর থেকে সে উচ্চারণ করে যে সে এখনও কমিউনিস্ট হয়নি, সবে তো সূত্রপাত--- "আভি কাঁহা বনচুকা। কোই রোজ বন্ যায়েগা।"[৪]

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ব্যাপক রদবদল ঘটে এবং পার্টি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নেয়। ১৯৪৯ সালে সরকার কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বহু রাজনৈতিক কর্মী গ্রেপ্তার হন। সমরেশ বসুও তার ব্যতিক্রম নন। কারাবাসের আগে লেখক প্রত্যক্ষ করেন মিল বন্ধের নামে অকারণ বোমাবাজি, তাঁর মনে হয়েছিল এই ঘটনা শ্রমিক হিতৈষণার পরিপন্থী। তাই কারাবাস ফেরত লেখকের মনে পার্টিতে পুনরায় যোগদানে অনীহা দেখা দিয়েছিল। ১৯৬৪ তে রচিত 'স্বীকারোক্তি' গল্পটি সমরেশ বসুর জেলবন্দী জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত। এই সময় থেকেই লেখকের রাজনৈতিক মতবাদ ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ক্ষেত্র থেকে ব্যক্ত হতে থাকে। শুরু হয় পার্টি বনাম ব্যক্তির দ্বন্দ্ব। উক্ত গল্পেই প্রথম এক রাজনৈতিক বন্দীর জবানী প্রকাশিত হয়েছিল।

'স্বীকারোক্তি' গল্পের নায়ক অনল রাজনৈতিক বন্দী। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাকে এক বিশেষ চেম্বারে রাখা হয়েছিল। সেখানে তার স্মৃতিতে ভেসে উঠেছিল পার্টি পূর্বজীবনের নিয়মভঙ্গের অপরাধজনিত শাস্তিগুলির খণ্ডচিত্র। এমনকি বিবাহিত জীবনেও স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা। এরপর অনলকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল লর্ড সিনহা রোডের একটি বাড়ীতে এক পাগলের সাথে। এই সময়

সে অনুভব করেছিল পার্টির তিন কমরেডের প্রশ্নের হিংস্রতা। গল্পের নায়ক তাই ঘোষণা করেছিল সত্যের স্বীকারোক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। "বাল্যে পিতামাতার কাছে, যৌবনে স্ত্রী বা প্রেমিকার কাছে, কর্মজীবনে পার্টির কাছে এবং বর্তমানে পার্টির গোপন তথ্য পুলিশের কাছে।"[৫] প্রতিক্ষেত্রেই এই অস্বীকার যান্ত্রিক নিয়মতন্ত্রের বিরুদ্ধে। জীবন সত্যের গভীরে অবগাহন করে অনল বুঝেছে পার্টির অ্যাকশান কমিটির কাছে বিশ্বস্ত থাকা মানে তাদের চরণদাস হয়ে থাকা। রাজনীতির নামে আপন স্বার্থসিদ্ধিকারী এই বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা লেখকের বহু গল্পেই প্রতিফলিত হয়েছে।

স্বীয় রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতায় লেখক লক্ষ্য করেছিলেন পার্টির মধ্যে একদল নৃশংস, সশস্ত্র, হত্যার নীতিতে বিশ্বাসী মানুষের বিদ্যমানতা। সমরেশ বসু ছিলেন মনুষ্যত্বে বিশ্বাসী। তাই 'স্বীকারোক্তি' পরবর্তী 'সিদ্ধান্ত' গল্পটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গল্পের মুখ্য চরিত্র কুণাল পার্টির সেই সশস্ত্র বিপ্লবী গোষ্ঠীর সদস্য। যার মা-বাবা উভয়েই পার্টির ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য। বাবার কাছেই কুণালের রাজনীতিতে দীক্ষা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সে ভিন্ন মত অনুসরণ করে। কুণালের বাবা তাদের মতবাদের সমালোচনা করায় তিনি হয়ে ওঠেন তাদের শত্রু। তাই পার্টি কুণালকে পিতৃহত্যায় সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়। পার্টি তাকে শেখায় সংগ্রাম ও আদর্শের কাছে সম্পর্কের কোনো স্থান নেই। কিন্তু কার্যসিদ্ধির কালে আদর্শ অপেক্ষা পিতার স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা বড়ো হয়ে উঠেছে। তাই সে সিদ্ধান্ত নেয় নিজেকে নিঃশেষ করার,--- "বাঁ হাত বাড়িয়ে পুরিয়াটা তুলে নিলাম। এর মধ্যে সেই অব্যর্থ বস্তু আছে। মৃত্যু। মৃত্যু। মুখে স্পর্শ মাত্র আর এটাও নিঃশব্দে ঘটবে।"[৬]

সমরেশ বসু সুবিধাবাদী রাজনীতির মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছেন 'পাতিহাঁস' গল্পে। গল্পের মুখ্য চরিত্র কমিউনিস্ট নেতা দেবনাথ দত্ত ছিল একদা পার্টিজান। কমিউনিস্ট পার্টি যখন নিষিদ্ধ হয় তখন সে জেল খেটেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে সে যখন রিকশার ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানার মালিক হয়ে যায় তখন বাস্তব জীবনে শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ককে সে পাল্টে ফেলে। তার মধ্যে ছাত্রজীবনের বিপ্লবীসত্তাটি বর্তমান থাকলেও তার কারখানার শ্রমিকরা যখন মজুরি বৃদ্ধির জন্য হরতাল করে এবং বাইরের মিস্ত্রি দিয়ে কাজ না করতে দেওয়ার দাবীতে অনড় থাকে তখন দেবনাথ নির্দ্বিধায় তাদের বলতে পারে--- "রিমেমবার, ইউ বেগারস--- নো ইউ আর নট প্রোলেটারিয়েট। তোরা ভিখিরির দল, ভিখিরি কখনও রিয়্যাল শ্রমিক আন্দোলন করে না।"[৭] শ্রমিক দরদী লেখক এখানে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পক্ষে খাড়া হন এবং মালিক যখন বুঝতে পারে শ্রমিক আন্দোলনে কেবলমাত্র শ্রমিকের ক্ষতি হয় না, মালিক পক্ষও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তারা সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়। তাই দেবনাথকেও কারখানা বাঁচিয়ে রাখার জন্য শ্রমিকদের দাবী মেনে নিতে হয়। লেনিন কথিত ন্যাশনাল বুর্জোয়া হয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হয় এবং সে ভাবে বিপ্লবে তারও ভূমিকা আছে।

সমরেশ বসুর গল্পে রাজনৈতিক পালাবদলের চিত্র বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। সত্তরের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের পটভূমিকে আত্মস্থ করে একদল তরুণ সাহিত্যিকদের আগমন ঘটেছিল। সমরেশ বসু ছিলেন তাঁদের প্রকৃত পূর্বসূরী। রাজনীতি সাধারণ মানুষের মনে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল তারই বাস্তব উদাহরণ 'শহীদের মা' গল্পটি। একটি পরিবারে মা ব্যতীত বাকী চার সদস্য রাজনৈতিক দলের কর্মী। কিন্তু প্রত্যেকেই ভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী। রাজনীতির মতবিরোধ ভাইয়ে ভাইয়ে এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে। স্বামী ও ছেলেদের মাঝখানে পড়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হতে থাকে এক নারী। স্বামী বা সন্তান কাউকেই বর্জন করার কথা তিনি ভাবতে পারেন না। স্নেহের বিভাজন তিনি জানেন না। জননী বিমলার ছোট ছেলে বাদল এক বছর আগে রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়েছে। বাদলের দলের লোকেরা তার স্মরণে শহীদবেদী করেছে। তখন শহীদের মা হিসাবে বিমলাকেও ডেকেছিল। বাবা বা দাদাদের ডাকেনি কেননা তারা অন্য পার্টির লোক। বাদলের মৃত্যুর এক বছর পরে তার জন্মদিনে বিমলা বাড়ির বাইরে একান্তে দাঁড়িয়ে বাদলের ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্মৃতিচারণে মগ্ন হয়েছেন। সংসারে বিমলা চারটি পার্টির লড়াই দেখেছেন। বাদলের মৃত্যুতে স্বামী বা তাঁর অপর সন্তানদের দলের হাত আছে কিনা তা তিনি জানেন না। সন্তানের অকাল বিয়োগ ব্যথায় তিনি ব্যথিত। জননী যন্ত্রণা কাতর নারীর কানে তাই স্বামীর ডাক পৌঁছায় না। পরম মমতায় যে সাংসারিক কর্তব্য তিনি এতদিন পালন করে এসেছেন, পারিবারিক লোকেদের পার্টির লোক হয়ে ওঠায় সেই কর্তব্য পালনে তাঁর অনীহা। তিনি রান্না না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ছেলেদের জানিয়েছেন, "তোরা আজ তোদের পার্টির কাজে যা। আমাকে ডাকিস না।"[৮] ভিন্ন রাজনৈতিক মত আত্মিক সম্বন্ধের মাঝে যে বিভেদের প্রাচীর তুলে দেয় সেই কথাই গল্পে শিল্পিত রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

সমরেশ বসু একদিকে শ্রমিক জাগরণ, অপরদিকে দলীয় স্বার্থপরতার প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করেন। এছাড়াও তিনি দেখিয়েছেন পার্টির পরিচালকরা অনেক সময় দলকে তাদের নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেন। 'মানুষ' গল্পের ধীরেশ চরিত্রটি সেই রকমই এক ব্যক্তি। ১৯৫২ সালের পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পটভূমি উক্ত গল্পে বর্ণিত হয়েছে। ক্ষমতাসীন দক্ষিণপন্থী দল বামপন্থী দলগুলিকে দমনের অছিলায় সৃষ্টি করেছিল সন্ত্রাসবাদ। বহু রাজনৈতিক হত্যার অভিঘাতে সভা সমিতিগুলোও তাদের কর্মক্ষমতা হারিয়েছিল। এই পর্যায়ে ধীরেশ গাঙ্গুলির মতো কিছু রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতার লোভে ধ্রুবর মতো সৎ পাটি কর্মীকে হত্যা করেছিল। সেই হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অপর এক পার্টিকর্মী সুজিত ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জেল থেকে ফিরে এসে সুজিত চেয়েছিল ধ্রুব হত্যার স্থানে নিয়ে গিয়ে ধীরেশের স্বীকারোক্তি আদায় করতে। ধীরেশদের সঙ্গে সেই সময় পার্টির প্রবীণ নেতাদের বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। প্রবীণ নেতারা আন্ডার

গ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছে দেখে ধীরেশের মতো নেতারা পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাবার পথহীন রাস্তা দিয়ে মিছিলের রুট নির্ধারণ করেছিল। পার্টির সৎকর্মীরা অর্ন্তদ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্যই এর বিরোধিতা করেন নি। ধ্রুবকেও ধীরেশ তিনবারের চেষ্টায় হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিল। হত্যার দিন বোমা-বারুদ যুক্ত সেই ধূমপান নিষিদ্ধ ঘরে সে বিনা কারণেই ধ্রুবর সাথে দেখা করতে এসে সিগারেট খেয়ে তার জ্বলন্ত টুকরো ঘরে ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। সেখান থেকে ধ্রুবর জীবনে নেমে এসেছিল চরম বিপর্যয়। লেখক দেখিয়েছেন যুগে যুগে ঘরের শত্রুরাই ঘরকে খণ্ডিত করে। লেখকের গল্পের চরিত্ররা বেশীরভাগই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার শিল্পিত রূপ। 'মানুষ' গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। ধ্রুব চরিত্রে লেখকের রাজনীতি দীক্ষাগুরু সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের ছায়া যেমন পড়েছে, তেমনি ধীরেশ চরিত্রটিও বি.টি. রণদিভে সমকালীন পার্টির ওপরতলা থেকে প্রেরিত শান্তি মুখার্জ্জীর অনুসারী। তবে লেখকের মৌলিকত্ব এখানেই যে তিনি ধীরেশের মতো নিকৃষ্ট মানুষের মনের গোপনস্থলে প্রবেশ করে তাকে মনুষ্যত্ববোধে উন্নীত করাতে পারেন।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের রঙ পাল্টানোর কথাও লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। 'বিবেক' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিভূতি মুখার্জী সেই ধারায় অনুসারী। ১৯৬৭ সালে বামফ্রন্টের সরকার গঠন বিভূতিকে আন্দোলিত করেছিল। কিন্তু সেই সরকারের পতন তার মনে জাগিয়ে তুলল সংশয়ের কালো মেঘ। কলেজ জীবন থেকেই বিভূতি ছাত্র আন্দোলন ও রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতায় পড়তে এসে তার সেই আন্দোলনের জগৎ আরো বিস্তৃত হয়েছিল। ধীরে ধীরে সে আকৃষ্ট হয়েছিল সশস্ত্র আন্দোলনের প্রতি, যার মূলমন্ত্র ছিল শ্রেণীশত্রু সংহার। কমিউনিস্ট পার্টির এই অবক্ষয়ের কালপর্বে কংগ্রেসের মদতপুষ্ট পুলিশের আক্রমণে বিভূতি গ্রেপ্তার হয়েছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জেল থেকেই সে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং জেল থেকে ছাড়া পেয়েও রং পালটাতে থাকে। কিন্তু স্ত্রী জ্যোতির প্রশ্ন--- "...কিন্তু যে নিরাপরাধ লোকগুলোকে তোমরা খুন করেছো তার কি হবে?"[৯] বিভূতির মধ্যে জাগিয়ে দেয় তার বিবেককে। পার্টির কর্মসূচী তার মনে কোনো দাগ কাটতে পারে না। যে নিরপরাধ ফেরিওয়ালাকে সে খুন করেছিল, তার বিধবা স্ত্রী কুসুমের সঙ্গে দেখা করতে ছুটে যায়।

রাজনীতি সমরেশ বসুর জীবনে এমনভাবে জড়িয়েছিল যে তাকে বাদ দেওয়ার কথা তিনি কোনোদিন ভাবেন নি। তবু কমিউনিস্ট পার্টির নৈতিক অধঃপতন তাঁকে বিচলিত করেছিল। তাই আশাবাদী লেখক সেই পতন থেকে রক্ষা পাবার জন্য সুযোগ্য নেতৃত্বের উপর বিশ্বাস রেখেছেন। যাদের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধিত হবে এবং পার্টি আবার স্ব-মহিমায় বিরাজ করবে।

তথ্যসূত্র:

১. সমরেশ বসু: 'গল্পসমগ্র' ৩য় খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী পুনর্মুদ্রণ: নভেম্বর ২০২২, পৃ. ৩৮৩
২. ঐ, পৃ. ৩৮৭
৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সমরেশ বসু রচনাবলী' ২য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স ১৯৯৮, পৃ. ৮০৩
৪. ঐ, পৃ. ৮১২
৫. ড. ঝুমা রায়চৌধুরী, 'কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু: সামগ্রিক মূল্যায়ন ২য়', পূর্বাশা ২০০৭, পৃ. ২৮১
৬. ড. নিতাই বসু সম্পাদিত 'সমরেশ বসুর গল্প সমগ্র' ২য় খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, জুলাই ২০১৫, পৃ. ৩৪৫
৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সমরেশ বসু রচনাবলী ৭', আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ. ৮০৪
৮. ড. নিতাই বসু সম্পাদিত 'সমরেশ বসুর গল্পসমগ্র' ২য় খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, জুলাই ২০১৫, পৃ. ৪৩৫
৯. ড. নিতাই বসু সম্পাদিত 'সমরেশ বসুর গল্প সমগ্র' প্রথম খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা ২০১৪, পৃ. ৩৬৪